বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ



ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৮/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা :
মঞ্জু দাশ
৭২৭, লেক টাউন
কলিকাতা-৫৫

প্রথম প্রকাশ— ১৩৬৭

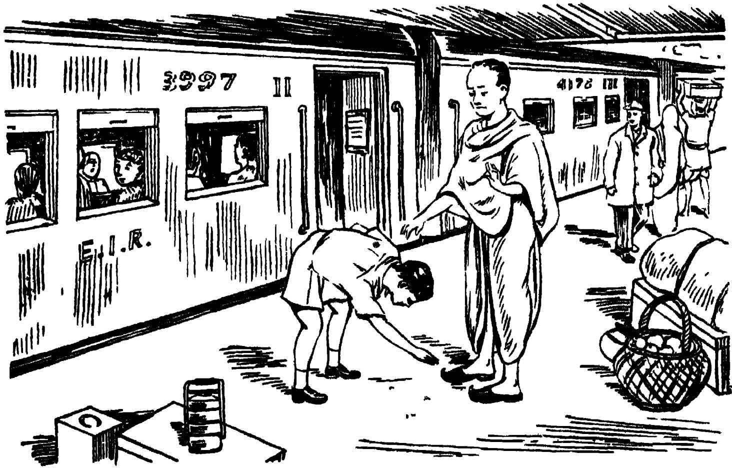
মুদ্রক :
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আমার কথা

বাংলাদেশের সমগ্র বাঙালীজাতির তথা ভারতবাসীর গৌরব যে স্যার আশুতোষের মত একজন তেজস্বী পুরুষসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন পরাধীন ভারতবর্ষের নগণ্য এক স্থানে। বাঙালীজাতিকে অনেকে বলে দুর্বল ও ভীরু কিন্তু তেজস্বী স্যার আশুতোষ এদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে চিরকালের মত এই অপবাদ নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আশা করি বাংলাদেশের ভাবী পুরুষগণ এই তেজস্বী পুরুষের জীবনী পাঠ করে তাঁর মত মনে-প্রাণে-কর্মে মহান হয়ে উঠবে এবং আমার এই শুভ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

প্রকাশিকা

মথুরায় এসেছে বালক শরীরটাকে সুস্থ-সবল করতে ! বেশ কিছুদিন এখানে কাটানোর পর এবার ফিরে যাবে কোলকাতায়। তাই সে মথুরা স্টেশনে কোলকাতাগামী ট্রেনে উঠলো।



ট্রেন থেকে নেমে আশুতোষ বিদ্যাসাগরকে প্রনাম করছেন

ট্রেন পরে এলো কাশী স্টেশনে। প্লাট্‌ফরমে গাড়ী থামতেই ভেণ্ডারদের ও যাত্রীদের ভীড়ে বালক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর ভীড় একটু পাতলা হলে সে দেখতে পেল গায়ে চাদর এবং পায়ে তালতলার চটিজুতো দিয়ে এক ব্যক্তি হেঁটে চলেছেন ! তাঁকে দেখামাত্র সে একলাফে ট্রেন থেকে নেমে প্রণাম জানালো।

ভদ্রলোক হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, গঙ্গাপ্রসাদের ছেলে না ?

বালক ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

তারপর ভদ্রলোক ওকে জিজ্ঞেস করলেন পড়াশুনোর কথা ! বালক তার যথাযথ উত্তর দিল।

এবার ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, এদিকে কোথায় এসেছিলে ?

—মথুরায়।

—কি জন্যে ?

—শরীর সারতে !

—এখন কোথায় যাচ্ছ ?

—কোলকাতায়।

এইসব কথাবার্তার পর বালক পুনরায় ট্রেনে ওঠে পড়লো। গাড়ী ছেড়ে দিল ! বালক তখনো তাকিয়ে আছে প্লাটফরমের ঐ ভদ্রলোকের দিকে। তিনিও সস্নেহ দৃষ্টি নিয়ে বালকটিকে দেখতে লাগলেন।

এই বালকটিই পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ নামে ভারত বিখ্যাত হন। আর যে ভদ্রলোকের সঙ্গে প্লাট্‌ফরমে বালকটির সাক্ষাৎ হয়েছিল তিনি হচ্ছেন বাংলার স্বনামধন্য পুরুষ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

২

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত হুগলী জেলার জিরেট্-বলাগড় গ্রাম। এই গ্রামে বাস করতেন মুখোপাধ্যায় পরিবার। এই পরিবারে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি হচ্ছেন আশুতোষের পিতামহ। এঁর জীবন অত্যন্ত বৈচিত্রময়! প্রথম কর্মজীবনে ইনি মুহুরীর কাজ করতেন। পরে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাদার বামুনঘাটার দারোগাগিরির কাজে নিযুক্ত হন।

চারটি পুত্র ছিল বিশ্বনাথের। তাঁরা হলেন দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ এবং রাধিকাপ্রসাদ। তাঁর সংসারে ছিল দারিদ্র। তাই তাঁকে ঋণ করে সংসার চালাতে হতো। কিন্তু তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন মাত্র সতেরো বছর তখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাপ্রসাদ পিতার কাছে জানায়, বাবা, তোমার কোনচিন্তা নেই আমাদের জন্যে। আমি তো বড় হয়েছি। আমি তোমার ঋণ শোধ করবো। সেই সঙ্গে মানুষ করবো আমার নাবালক ভাইদের।

পুত্রের মুখে উপযুক্ত আশ্বাস শুনে পরম শান্তিতে এবং সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন ধার্মিক বিশ্বনাথ।

গঙ্গাপ্রসাদের প্রতি দুর্গাপ্রসাদের স্নেহ ছিল বেশী। ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জন্মগ্রহণ করে গঙ্গাপ্রসাদ। সে অপূর্ব

মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছিল। বাল্যকাল হতেই সে অনেক পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে। তার ফলে জ্যেষ্ঠের কষ্টের অনেকটা অবসান ঘটে।

হেয়ার স্কুলে পড়াশুনো করতো গঙ্গাপ্রসাদ। ঐ স্কুল থেকেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আগেই বলেছি গঙ্গাপ্রসাদের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। বাড়ীতে রেড়ীর তেলের আলোয় পড়াশুনো করতো। যখন তেল থাকতো না তখন চলে যেতো রাস্তায়। সেখানে ল্যাম্পের আলোয় লেখাপড়া করতো।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি ছিল তখন দশ টাকা। গঙ্গাপ্রসাদের পক্ষে ঐ টাকা যোগাড় করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু সে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে ঐ টাকা সংগ্রহ করে। পরে ঐ টাকা সিনেট হাউসে জমা দেবার জন্যে যায়। পথে এক বিপত্তি ঘটে।

এক পকেটমার তার পকেট কেটে নেয়। ফলে পরীক্ষার ফি জমা দেবার আশা অন্তর্হিত হলো। টাকা নেই তো ফি জমা দেবে কিভাবে।

মনের বেদনা নিয়ে পথ চলতে লাগলো গঙ্গাপ্রসাদ। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক পাদরী অধ্যাপকের।

অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন গঙ্গাপ্রসাদকে, খোকা, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি দুঃখ পেয়েছ। তোমার কি হয়েছে আমাকে জানাবে কি? উত্তরে গঙ্গাপ্রসাদ বললো, আমি সিনেট হাউসে পরীক্ষার ফি জমা দিতে যাচ্ছিলুম, এমনসময় এক

পকেটমার এসে আমার পকেট কাটলো। আমি এখন মহা বিপদে পড়েছি। কি করি তাই ভাবছি। আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে চাইবো, তারও উপায় নেই।

পাদরী অধ্যাপক বুঝতে পারলেন গঙ্গাপ্রসাদের মনোবেদনা। তিনি বললেন, খোকা তুমি ভেবোনা। এই নাও তোমার ফি দশ টাকা।

এই বলে অধ্যাপক তাঁর পকেট হতে নগদ দশ টাকার নোট বের করে দিলেন।

তাই পেয়ে খুশী হলো গঙ্গাপ্রসাদ। সে আনন্দিত মনে ঐ টাকা জমা দিয়ে এলো সিনেট হাউসে গিয়ে।

এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হলো গঙ্গাপ্রসাদ। সেখানে চার বছর পড়ার পর বি. এ. পাশ করে। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া শুরু করে। কিন্তু এতে বিশেষ কোন লাভ হবে না দেখে সে ডাক্তারী পড়া আরম্ভ করে দিল।

বেশ মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারী পড়তে লাগলো গঙ্গাপ্রসাদ। মেডিকেল কলেজের কয়েকটি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখন তার বয়েস হবে প্রায় আঠাশ বছর।

গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন সোমবার অতি ভোরে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষের জন্ম হয়। সে তখন বৌবাজার মলঙ্গা লেনে একটা ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতো।

৩

গঙ্গাপ্রসাদের বিদ্যাবুদ্ধি লক্ষ্য করে খুসী হলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ। বিশেষ করে অধ্যাপক প্যাট্রিজ গঙ্গাপ্রসাদের প্রতিভা দেখে বিস্মিত হন। তিনি একদিন গঙ্গাপ্রসাদকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি বিলেত যাবে ?

গঙ্গাপ্রসাদ বললে, আমি ঠিক কথা দিতে পারব না। দাঁড়ান মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।

গঙ্গাপ্রসাদ ছিলো মাতৃভক্ত সন্তান। মায়ের আদেশ না নিয়ে কোন কাজ করতো না।

মাকে জিজ্ঞেস করলো গঙ্গাপ্রসাদ, মা, অধ্যাপক আমাকে বিলেত পাঠাতে চাচ্ছেন। তোমার এতে মত আছে কি ?

মা বিলেতের নাম শুনে ভয় পেলেন। বললেন, না, তোমাকে ওদেশে যেতে হবে না। এখানেই পড়াশুনো করো।

গঙ্গাপ্রসাদ তখন কিছু না বলে চলে এলো প্যাট্রিজের কাছে। তাঁকে জানালে মায়ের আদেশ।

সাহেব শুনে চুপ করে রইলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের মার পুত্রকে বিলেত না পাঠাবার কারণ হচ্ছে সেই যুগে এদেশের কেউ বিলেত গেলে সমাজে তাকে একঘরে করতো সেই ভয়ে গঙ্গাপ্রসাদকে ওদেশে যেতে নিষেধ করেন তাঁর মা।

এ দেশে থেকেই চিকিৎসা বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করে

গঙ্গাপ্রসাদ এবং ডাক্তারী শাস্ত্র পাঠ করার পর স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেন।

সেই সময় ভবানীপুরে বেশ ধনী ও মানী লোক বসবাস করতেন। খ্যাতনামা বিচারপতি শম্ভুনাথ, দ্বারিকানাথ, কবি হেমচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্ত এই ভবানীপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের ছোট ভাই রাধিকাপ্রসাদ বিয়ে করেন ভবানীপুরে। তার শ্বশুর চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলীর এখানে একটি ডিস্‌পেনসারী ছিল। তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে পরামর্শ দেন তাঁর ডিস্‌পেন্‌সারীতে থেকে চিকিৎসা ব্যবসা চালাবার জন্যে। তাছাড়া প্রসন্নকুমার বসু নামে গঙ্গাপ্রসাদের এক বন্ধুও তাঁকে ঐ একই পরামর্শ দেন। ফলে গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুরেই তাঁর কর্মস্থল বেছে নেন।

ছোট ভাই রাধিকাপ্রসাদ ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার আর গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তার। দু'ভাই ভবানীপুরে বাস করতে লাগলেন।

৪

অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেন গঙ্গাপ্রসাদ। তাঁর এই সুনাম অর্জনের মূলে ছিল সহৃদয়তা এবং কম ফি। তিনি মাত্র দুটাকা ফি নিতেন। কখনো কখনো তা বেড়ে হতো চার টাকা। তাও অনেক সময় ফি নিতেন না রোগীদের কাছ থেকে। বিনা ভিজিটেই দেখতেন রোগী।

বাঙালীদের মঙ্গলের কথা অষ্টপ্রহর চিন্তা করতেন গঙ্গাপ্রসাদ। সেই সময় এদেশে বাংলাভাষায় কোন চিকিৎসাশাস্ত্র রচিত হয় নি। ফলে অল্প মেধার ছাত্ররা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতো। তাদের সেই অসুবিধা দূর করার জন্যে গঙ্গাপ্রসাদের বাংলাভাষায় চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক বই লিখতে ইচ্ছা হয়। তাঁর প্রথম বইয়ের নাম হচ্ছে 'মাতৃশিক্ষা'।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্র্যাক্‌টিশ অব মেডিসিন' প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ দু'বছর পর আর একখানি বাংলা ভাষায় চিকিৎসা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার নাম 'শারীর বিদ্যা'।

পদ্যছন্দে গঙ্গাপ্রসাদ রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন কিন্তু সেই অর্থ বিলাসব্যসনে কোনদিন ব্যয় করেন নি। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও কর্মশীল। পোষাক-আশাকে বেশী আড়ম্বর ছিল না। তাই পুত্র আশুতোষকেও সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে যান। নিজে বিত্তশালী হয়েও এক দরিদ্র ঘরের রূপগুণসম্পন্না কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন পুত্র আশুতোষের।

৫

গঙ্গাপ্রসাদ নিজে যেমন অধ্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী ছিলেন তেমনিভাবে তাঁর পুত্র আশুতোষকেও তৈরী করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জগত্তারিনী পুত্রের বিদ্যাভ্যাসের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি রাখতেন।

পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র আশুতোষকে সবসময় উপদেশ দিতেন—তোমাকে দশজনের একজন হতে হবে। ভাল করে সবকিছু শিখতে হবে। পড়ো, তাহলেই সব জানতে পারবে।

এই তিনটি উপদেশ আশুতোষ সবসময় ভাল করে অনুসরণ করে চলতো।

বাড়ীতে বাবা-মার কাছে প্রথমভাগ শেষ করলো। তারপর ভর্তি হলো ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে। প্রথম দিন বিদ্যালয়ে গিয়ে বালক আশুতোষের জীবনে প্রকাশ পেল নতুন এক অভিজ্ঞতা। সে দেখলো, বিদ্যালয়ে রীতিমত হৈ-হট্টোগোল লেগে গেছে। ছেলেমেয়েদের কারো পড়াশুনোয় মন নেই! একটা দালানে বসে সকলে পড়ছে। পড়ার জন্যে কোন নির্দিষ্ট ঘর নেই।

ঐ দৃশ্য দেখার পর বালক বেশীক্ষণ বিদ্যালয়ে রইলো না। সে চলে এল বাড়ীতে।

বাড়ীতে আসার পর বাবার কাছে গিয়ে জানালে তার মনের কথা, বাবা, আমি আর ও স্কুলে পড়বো না।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেন ?

পুত্র বললে, ও-তো স্কুল নয়, হট্টোগোলের আসর।

পুত্রের কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন গঙ্গাপ্রসাদ। তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছু জেনে নিলেন বিদ্যালয় প্রসঙ্গে। তারপর গেলেন গুরুমশাইয়ের কাছে। গুরুমশাইকে বললেন, ঘরের কি অভাব ? ছেলেমেয়েদের এভাবে এক জায়গায় পড়াচ্ছেন কেন।

গুরুমশাই বললেন, হ্যাঁ ঘরের অভাব !

তাই শুনে গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, বেশ দু'খানা ঘরের ব্যবস্থা করুন, আমি টাকা দেবো।

তাই করলেন গুরুমশাই। টাকা দিয়ে ঘর তুললেন। এখন থেকে তাঁর পাঠশালা বেশ ভালভাবে চলতে লাগলো। আর কোন রকম হৈ-হট্টোগোল হলো না।

জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন বা নাম করেছেন তাঁরা সকলে খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করতেন। আশুতোষও খুব ভোরে উঠতো। পিতা তাকে নিয়ে যেতেন বেড়াতে। সেইসময় তিনি পুত্রকে মুখে মুখে অনেক রকম শিক্ষা দিতেন।

দু'বছর পড়াশুনো করলো আশুতোষ শিশুবিদ্যালয়ে। তারপর তার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ তাকে বাড়িতে রেখে পড়াতে লাগলেন। একজন গৃহশিক্ষক রাখলেন। তাছাড়া নিজেও পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। পুত্রের প্রতি কর্তব্যের কোনরকম ত্রুটি হতো না। এভাবে আশুতোষ আট বছর বয়েস থেকে দশ বছর বয়েস পর্যন্ত বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনো করলো।

নিজের পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও বাইরের অনেক বই পড়তো আশুতোষ। সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান পুস্তক হলো 'রবিনশন ক্রুশো' এবং 'গ্ল্যালিভারস্ ট্রাভল'।

'গ্ল্যালিভারস্ ট্রাভল' বই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলতো, 'এরকম বই পড়লে অনেক কিছু জানা যায়'। আর তার স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ! একবার যে বই পড়তো তা সহজে ভুলতো না।

পড়াশুনোয় অতিরিক্ত শ্রম করতো বলে বালক আশুতোষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো! বুকের ব্যাধি দেখা দিল। গঙ্গাপ্রসাদের বন্ধু মেডিকেল কলেজের সুচিকিৎসক ডাঃ চার্লস দেখলেন আশুতোষকে। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল ফললো না। তখন তিনি আশুতোষকে হাওয়া বদলানোর পরামর্শ দিলেন।

ডাক্তারের পরামর্শ মত বালক আশুতোষ চললো মথুরায়। সেখানে তার আত্মীয় বাড়ীতে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিল। প্রতিদিন তিনসের করে দুধ আর মাখন খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সেই সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ। ব্যস্ দেখতে দেখতে দু'মাসের মধ্যে শরীর ভাল হয়ে উঠলো।

দু'মাস পরে মথুরা হতে ফিরে এলো আশুতোষ! ফেরার পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কাশী রেলওয়ে ষ্টেশনে!

মথুরা থেকে যখন ফিরলো তখন আশুতোষের বয়স মাত্র এগারো বছর। ঐ সময় অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সে ভর্তি হলো সাউথ সুবার্বাণ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে।

স্কুলে ভর্তি হবার সময় যেসব পরীক্ষা হলো তার প্রতিটি বিষয়ে ফুল মার্ক পেয়ে পাশ করলো আশুতোষ। তার অপূর্ব মেধার পরিচয় পেয়ে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী বিস্মিত হলেন। কেবল তাই নয় আশুতোষ ঐ বয়সে বীজগণিতের অনেকখানি শিখে ফেলেছিল। মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'-এর প্রথম সর্গ আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারতো। ঐ বয়সে এমন মেধাশক্তির পরিচয় খুব কম বালকের মধ্যেই দেখা যায়। স্কুলের শিক্ষকগণের কাছে অতি অল্পকালের মধ্যে আশুতোষ প্রিয় হয়ে ওঠে।

বাড়ীতে পিতার কাছ থেকে সবসময়ের জন্যে প্রেরণা পেত ছাত্র আশুতোষ। তার মনে উচ্চাভিলাষ জীবনে বড় হতে হবে! পিতা গঙ্গাপ্রসাদ প্রায়ই বলতেন পুত্রকে, তুমি জীবনে বড় হবে, দ্বারিকের মত জজ্ হবে।

তাঁর এই কথা বলার পিছনে যথেষ্ট কারণও ছিল। তখনকার দিনে কোলকাতা হাইকোর্টের নামকরা বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্রের খুব নাম ডাক ছিল। তিনি ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদের পরম বন্ধু। তিনি প্রতিদিন সকালবেলায় আসতেন গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ীতে! অনেক কথাবার্তা হতো দু'জনের মধ্যে। আশুতোষ দ্বারিকানাথকে দেখে খুব আনন্দিত হতো। কারণ সে ছিল উচ্চাভিলাষী ছাত্র। দ্বারিকানাথের মত হাইকোর্টের বিচারপতি হবার বাসনা রাখতো। তাছাড়া তার মনে তখন আর একটা বাসনাও জাগে! তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ বৃত্তির প্রচলন হয়। ঐ বৃত্তি যে লাভ করতো সমাজে তার

বেশ প্রতিষ্ঠা হতো। সুতরাং আশুতোষ উত্তরজীবনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে ছিল হাইকোর্টের জজ হবার ইচ্ছা। কায়মনোবাক্যে এই বাসনা সে জীবনে আঁকড়ে ধরেছিল। চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে সে এই পথে এগিয়ে যেতে লাগলো।

ওদিকে সন্তানবৎসল গঙ্গাপ্রসাদও পুত্রের উচ্চাভিলাষ পূরণে যত্নশীল হলেন। পুত্রকে কোনদিন দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশতে দিতেন না।



বইর দোকান থেকে বিদ্যাসাগর আশুতোষকে বই কিনে দিচ্ছেন

স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ছেলেকে। তার জন্যে একজন সুযোগ্য গৃহশিক্ষকের বন্দোবস্ত করলেন। ঐ বয়সে আশুতোষ পাঠে অধিক মনোযোগ দেয়। স্কুলের বই ছাড়াও অন্য বাইরের বই পড়তো। তাই লক্ষ্য করে গঙ্গাপ্রসাদের বন্ধুরা বলতেন, 'আশু

যে এরই মধ্যে অনেক বই শেষ করে ফেলেছে দেখছি। সবে তো ফোর্থ ক্লাস, কিন্তু ক্যাম্বেলের কবিতা পর্যন্ত গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারে। ছেলেতো নয়, যেন হীরের টুক্‌রো'।

একদিন আশুতোষ কি একটা কাজে এসেছে ধর্মতলায়। তার ইচ্ছা সে আসবে বিখ্যাত বইয়ের দোকান থ্যাকার স্পিঙ্কে। তখনকার দিনে এই দোকানটি ছিল বেশ নামকরা পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র। ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছে আশুতোষ। একসময় তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি আশুতোষের জন্যে একখানি বই কিনলেন। বইটির নাম 'রবিনশন্ ক্রুশো।'

বইটি আশুতোষের হাতে তুলে দিয়ে বিদ্যাসাগর তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছ ?

উত্তরে আশুতোষ জানালে, সাউথ সুবার্বন স্কুলে।

ছাত্রজীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতো আশুতোষ। ছাত্র-জীবনের কথা প্রসঙ্গে আশুতোষ পরবর্তী জীবনে বলতেন, 'সাউথ সুবার্বনে যখন আমি ভর্তি হলুম তখন একদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেনঃ 'তুমি যত দিন ক্লাসে প্রথম থাকতে পারবে, রোজ তোমাকে এক টাকা করে দেবো। দ্বিতীয় স্থানে থাকলে আট আনা করে পাবে। আমার মনে আছে, আমি বছরের মধ্যে মাত্র দু'দিন আট আনা পুরস্কার পেয়েছিলুম, তাছাড়া রোজই এক টাকা করে পেতুম।'

আগেই বলেছি, শৈশব থেকেই পাঠে মনোযোগ ছিল আশুতোষের। পড়ার জন্যে তাকে কোনরকম তাগাদা দিতে হোত না। সে নিজে থেকেই বই-পত্তর খুলে নিয়মিত ভাবে পড়াশুনো করতো। গৃহশিক্ষক পড়ার জন্যে বাড়ীতে আসার আগে থাকতেই সে নিজের পাঠ্য পুস্তক খুলে পড়তো। কেবল তাই নয় গৃহ শিক্ষক চলে যাবার পরও পড়াশুনো করতো। এমন কি বিছানায় শোবার সময় দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে শুতো। রাতে ঘুম ভাঙ্‌লে মোমবাতি জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করতো।

অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অঙ্কে বেশী ঝোঁক ছিল আশুতোষের। পিতা গঙ্গাপ্রসাদও বুঝতেন আশুতোষের প্রতিভার কথা। তাই পুত্র যাতে অঙ্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এই আশায়

তিনি সুযোগ্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন! তাছাড়া তিনি নিজেও পুত্রকে অঙ্কবিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

গঙ্গাপ্রসাদের মনে একান্ত বাসনা ছিল যে তাঁর পুত্র সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করুক। যোগ্য পুত্র আশুতোষ পিতার এই অভিলাষ পূর্ণ করেছিল। অঙ্ক, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল। এছাড়া সে দীর্ঘ ঊনিশ বছর ধরে পণ্ডিত পঞ্চানন পালধির কাছে সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করে। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের জন্যে ভাল ভাল জ্ঞানগর্ভের বই কিনে দিতেন। দেখতে দেখতে আশুতোষের পাঠঘরটি একটি ছোটখাটো পাঠাগারে পরিণত হলো।

এই প্রসঙ্গে আশুতোষের জীবনীকার লিখেছেনঃ 'তিনি নানা বিষয়ের নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন এফ-এ পরীক্ষার পাঠ্য ইংরাজ কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' প্রথম ভাগ সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তখনই অনুশীলনীর সহিত চারিভাগ জ্যামিতি কষিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, মার্সম্যানকৃত ভর্তির বর্ষের ইতিহাস তিন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়া ছিলেন এবং কথামালা আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চরিতাবলী, নীতিপথ—এই সকল পুস্তক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।'

ছেলে কেবল ঘরে বসে বই পড়বে আর ঘরকুনো ও মুখচোরা হয়ে থাকবে এই রকম আশা করেননি গঙ্গাপ্রসাদ। জীবনে উন্নতি করতে হলে প্রকাশ্যে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা

বলতে হলে সকলের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে। এই জন্যে মুখের ভাষায় এবং চলাফেরায় খুব স্মার্ট হ'তে হবে।

আশুতোষ ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মুখচোরা ও ঘরকুনো ছিল। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একদিন তিনি চাকর বনমালীকে দিয়ে খবর পাঠালেন আশুতোষের কাছে। বনমালী এসে আশুতোষকে জানাল—দাদাবাবু, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

আশুতোষ চললো পিতার কাছে। পিতার ঘরে প্রবেশ করে দেখে, প্রকাণ্ড ঘরটার মধ্যে বাবা একা দাঁড়িয়ে, আর কেউ নেই।

পিতা তাকে দেখে বলে উঠলেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও। আশুতোষ বন্ধ করে দিল দরজা।

তারপর গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, ঐ টুলটার ওপরে গিয়ে দাঁড়াও হাত দুটো এমনি করে বুকের কাছে রাখো।

এই কথা বলে ভঙ্গিটা নিজেই দেখিয়ে দিলেন। আশুতোষ নিঃশব্দে পিতার নির্দেশ রক্ষা করলো।

পিতা বললেন, ঠিক হয়েছে। এইবার সামনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে 'প্যারাডাইস লস্ট' থেকে একটু আবৃত্তি করো!

আশুতোষ তাই করলো।

তারপর গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, এমনি করে রোজ অভ্যাস করবে তাহলেই দেখবে বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাটা তোমার আয়ত্ত হবে। এই ঘরের চাবিটা বনমালীর কাছে থাকবে। রোজ একটা সময়ে এই ঘরে এসে আধঘণ্টা করে প্র্যাক্‌টিস্ করবে।

আশুতোষ একটু চিন্তা করে বুঝতে পারল কেন তার পিতা তার জন্যে এই রকম ব্যবস্থা করেছেন। কিভাবে ভাল বক্তৃতা দেওয়া যায় এই কারণে তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষের জন্যে কয়েকখানি ভাল ইংরাজী বই কিনে দেন। তাতে লেখা আছে কিভাবে ভাল বক্তৃতা দেওয়া যায় তার পদ্ধতি ও কৌশল। সেই সঙ্গে তিনি পুত্রের জন্যে একটি ভাল অভিধানও কিনে দেন যাতে তার উচ্চারণ স্পষ্ট ও সুন্দর হয়।

এইভাবে আশুতোষের ছাত্রজীবন সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে লাগলো।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ এন্ট্রানস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। সে হলো দ্বিতীয়। প্রথম হলো অন্য একজন। তার নাম প্রসন্ন কুমার। সে ছিল হিন্দু স্কুলের বিখ্যাত ছাত্র। তার মেধা ছিল খুব বেশী।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারলো না বলে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের মনে দুঃখ জাগলো। কিন্তু তা সত্বেও ঐ পরীক্ষায় আশুতোষের কম কৃতিত্ব ছিল না। প্রবেশিকা ছাড়া আর কোন পরীক্ষাতে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেনি।

এবার আশুতোষ ভর্তি হলো কলেজে। তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হলো।

৭

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলো আশুতোষ। তখন কনি সাহেব ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। সেইসময় ঐ কলেজে অনেক নামকরা অধ্যাপক ছিলেন! তাঁরা হলেন বুথ, রো, পার্সিভ্যাল এলিযট, ওয়েব, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। রো সাহেব ছিলেন ইংরাজীর অধ্যাপক এবং গণিতের অধ্যাপক ছিলেন বৃদ্ধ বুথ সাহেব।

পার্সিভ্যাল সাহেব সেই বছরেই বিলেত থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে এলেন। এই কলেজে তাঁর মত ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক খুব কমই হযেছেন। শেষ জীবনে তিনি অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় অনেক ভাল ছাত্রদের সাহচর্য লাভ করে আশুতোষ। তারা হলো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আশুতোষ চৌধুরী, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, আবদুর রহিম, সামসুল হুদা এবং আরো অনেকে। এঁরা সকলেই পরের জীবনে বাংলার স্বনামধন্য ব্যক্তি হন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা পড়াশুনো করতো। তারা কিন্তু সাউথ সুবার্বণ স্কুলের ছাত্রদের মত ছিল না। তাদের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বেশ চাক্‌চিক্য এবং পরিপাটি। তাদের ঐরকম বেশভূষা লক্ষ্য করে আদৌ বিচলিত হলো না আশুতোষ। সে সাদাসিধে পোষাক পরতে ভালবাসতো। ছোট বেলা থেকে সে

ঐভাবে মানুষ হয়েছে। তাই অন্য ছেলেদের সুন্দর ও চাকচিক্যময় সাজপোষাক দেখে তার মনে আদৌ কোন উত্তেজনা সৃষ্টি হলো না। তাছাড়া পিতা গঙ্গাপ্রসাদ একদিন পুত্রকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এইবার তুমি কলেজে পড়তে যাচ্ছ। অধ্যয়ন ছাত্রদের তপস্যা, এই কথা তুমি পণ্ডিত মশায়ের কাছে শিখেছ। কাজেই কোনরকম বাবুগিরি বা বিলাসিতার দিকে যেন তোমার ঝোঁক না যায়।

শেষ পর্যন্ত তাই অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ অনেক দূর। তাই যানবাহন ছাড়া যাতায়াত করা যায় না। ঠিক হলো আশুতোষ এবং পাড়ার কয়েকজন ছাত্র একসঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে করে কলেজে যাতায়াত করবে। সেইমত প্রতিদিন আশুতোষ যেতে লাগলো।

কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন উইলিয়াম বুথ। তিনি আশুতোষকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তার দু'টি কারণ আছে। প্রথমে আশুতোষের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, দ্বিতীয়ত গণিতে তাঁর অনন্য সাধারণ নিষ্ঠা।

কলেজে বেশ ভালভাবে পড়াশুনো করতে লাগলো ছাত্র আশুতোষ। পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও অন্য পুস্তক পড়ার দিকে তার ঝোঁক গেল বেশী। কলেজের শেষ ঘণ্টা পড়তো বেলা তিনটের সময়। চারটে বাজলে গাড়ী ছাড়তো। এই এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করতো না। কলেজের লাইব্রেরীতে বসে আপন মনে বই পড়তো। ঐ কলেজের লাইব্রেরীর বই তার উন্নত জীবনের পক্ষে অনেকখানি সহায় হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে সে বলেছে ঃ "প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হওয়াই আমার জীবনের উন্নতির মূল।

কলেজের বিশাল লাইব্রেরী দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হতাম। ভাবতাম—এই বিশাল গ্রন্থ-সমুদ্র কি একজনের জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? মানুষের জ্ঞানের কি সীমা নেই? পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই যার উপর না রচিত হয়েছে অজস্র গ্রন্থ। মানুষ কেমন করে এত জ্ঞান লাভ করে? এইসব চিন্তা করতাম আর আমার মনের মধ্যে জেগে উঠতো একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা—আমি কি অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে এই রকম জ্ঞানলাভ করতে পারব না?'

লাইব্রেরীতে কেবল বই পড়তো না আশুতোষ। সেই সঙ্গে পড়তো মাসিক পত্রিকা। তখন বিলেত থেকে আসতো অঙ্কের পত্রিকা। আশুতোষ যত্ন সহকারে ঐ পত্রিকা পড়তো এবং তাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগতো।

আশুতোষ তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বয়স মাত্র ষোল বছর। ঐ বয়সেই সে ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞা পাঠিয়ে দেয় বিলেতের অঙ্ক-পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। সম্পাদক সেইটি পড়ে খুসী হন। পরে সেইটি প্রকাশিত হয় পত্রিকায়। সেই পত্রিকা কলেজে এলে অধ্যাপক-বৃন্দ অত্যন্ত খুসী হন আশুতোষের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে।

গণিতে ছিল আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় সে এম-এ পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ফেলে। সেই সঙ্গে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে থাকে নিয়মিতভাবে। ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষা শিখতে লাগলো। কারণ সেই সময় ফরাসী দেশের বিখ্যাত

গাণিতিক লাপ্লাসের গণিত সম্পর্কে মতামত সারা বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছে। গণিতে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে হলে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা উচিত। এই মনে করে আশুতোষ রীতিমত ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করার ব্রত গ্রহণ করে।

এই সব বিদ্যা শেখার মাঝে মাঝে অন্য বিদ্যাও বাদ গেল না। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় তার দখলে আসতে লাগলো।

অধিক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারতো না আশুতোষ। কারণ পিতার নির্দেশ, রাত দশটার পর আলো জ্বেলে পড়াশুনো করা চলবে না। ওতে করে স্বাস্থ্যহানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে।



আশুতোষ শয্যা ত্যাগ করে অধিক রাত্রে পড়তে বসেছেন

কিন্তু পড়ুয়া আশুতোষ পিতার সেই আদেশ শুনলো না। পিতার নিদ্রা যাবার আধ ঘণ্টা পরে সে শয্যা ত্যাগ করে আলো জ্বেলে আবার পড়তে বসতো।

একদিন পিতা জানতে পারলেন পুত্র অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করে। সেদিন তিনি কি একটা কারণে ঘুম থেকে জেগে উঠে বাইরে এসেছেন। এসে দেখেন আশুতোষের ঘরে আলো জ্বলছে।

তাই দেখে তিনি চলে এলেন আশুতোষের কাছে। নম্র ভাষায় বললেন, অতো রাত করে পড়াশুনো করা কি ভাল? ওতে করে শরীর খারাপ হবে যে।

সত্যিই তাই হলো। অল্পকালের মধ্যে আশুতোষ অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন পিতা গঙ্গাপ্রসাদ তাকে পাঠিয়ে দিলেন গাজিপুরে। সেখানে তখন তার জ্যাঠামশাই থাকতেন। আশুতোষ সেখানে গিয়ে দু'মাস থেকে শরীর ভাল করে আবার চলে এলো কোলকাতায়। কিন্তু কোলকাতায় আসার পর সে আক্রান্ত হলো টাইফয়েড্ রোগে। সেপ্টেম্বর মাসে সে রোগাক্রান্ত হলো আর তার এফ. এ-র ফাইন্যাল পরীক্ষা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে। পিতা আপত্তি জানালেন, তোমাকে এ বছর পরীক্ষা দিতে হবে না। সামনের বছর বরং সুস্থ শরীরে পরীক্ষা দিও।

দৃঢ়মন আশুতোষ এর জন্যে ঘাবড়ে গেল না। অটুট মনোবল দিয়ে সে বস্‌লো পরীক্ষায় এবং পাশও করলো। প্রথম স্থান অধিকার না করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো।

এমনি মনোবল ছিল বাংলার বাঘ আশুতোষের। এর বলে সে রোগ-শোক-অভাব-অভিযোগ সবকিছু একপাশে হটিয়ে দিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে।

৮

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সিনেটের সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। তাই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কাগজপত্র আসতো। আশুতোষ ঐ সকল কাগজ মনোযোগ দিয়ে পড়তো।

এবার বি, এ পড়া শুরু করলো আশুতোষ। এ কোর্সে ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও অতিরিক্ত গণিত—এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করলো।

ডঃ বুথকে ভালবাসতো আশুতোষ। কারণ বুথ খুব সুন্দর ভাবে গণিত বোঝাতে পারতেন। তিনি অতিরিক্ত গণিতের ক্লাসে ম্যালসনের কণিক সেক্রন পড়াতেন। অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অনেক ছাত্র বুঝতে পারতো না। অথচ বুথ খুব তাড়াতাড়ি পড়াতেন। একদিন এক ঘণ্টার মধ্যে ৭৫ পাতা পড়িয়ে বুথ বললেন, এ খুব সোজা, এ তোমাদের আর কি বোঝাব?

অধ্যাপকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল অনেক ছাত্র। নীরবে তাকিয়ে রইলো অধ্যাপকের মুখের দিকে। আশুতোষ কিন্তু তেমন করলো না। সে চুপ করে বইয়ের পাতায় মনসংযোগ করলো। তার পক্ষে এসব বিষয় বুঝতে আদৌ কষ্টকর মনে হলো না। কারণ সে আগে থেকেই এই বিষয়টি পড়ে নিয়েছে।

কলেজে পড়ার সময় আশুতোষ কিন্তু অন্য বই পড়ার নেশা

ছাড়ে নি। তার পড়ার ঘরটা একটা ছোটখাটো লাইব্রেরী হয়ে উঠলো। একুনে পনেরো হাজার টাকায় বই কেনা হলো। এছাড়া ডিবেটিং ব্যাপারে তার উৎসাহ দেখা দিল প্রচুর। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের সে একজন উৎসাহী সভ্য হলো এবং নিয়মিত ভাবে ডিবেটিং-এ যোগ দিতো।

একসময় কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক মারা যান। আশুতোষ আগ্রহী হয়ে অধ্যাপকের নামে একটি স্মৃতিফলক তৈরী করা এবং সে লাইব্রেরী হলের মধ্যে স্থাপন করার জন্যে চাঁদা তোলে।

আশুতোষ তখন চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র। সেই সময় কোলকাতায় দেখা দেয় এক তুমুল উত্তেজনা। এই উত্তেজনা ঘটে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ্যে গ্রেপ্তার ও দণ্ডের প্রতিবাদে।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ছাত্রদের নেতা। তাছাড়া তিনি ছাত্রদের পড়াতেনও সুন্দরভাবে। তাই ছাত্ররা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতো।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আদালতে বিচার হয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের। সেই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের বহু ছাত্র আদালতে এসে সুরেন্দ্রনাথের বিচার দেখতো। আশুতোষও যেত।

তারপর সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর যখন তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হলো রিপন কলেজে সেই সময় যুবক আশুতোষও উপস্থিত ছিল।

আশুতোষের ছাত্রজীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। আশুতোষ তখন বি, এ ক্লাসের ছাত্র। তখন বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থির করলে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ্ উঠিয়ে দিয়ে ঐ টাকায় এদেশীয় ছাত্রদের বিলেত পাঠানো হবে উচ্চশিক্ষার জন্যে।

বোম্বাইয়ের ধনী ব্যবসায়ী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করার জন্যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নগদ দু'লক্ষ টাকা দান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ দাতার নামেই স্কলারশিপ সৃষ্টি করেন। নিয়ম ছিল, এম-এ পরীক্ষার পর সি, আর, এস পরীক্ষায় যে প্রথম হবে তাকে দেওয়া হবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

আশুতোষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব আদৌ মঙ্গলকর হলো না। কারণ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আশুতোষের পক্ষে সি, আর, এস হবার আশা ব্যর্থ হবে। তাই সে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং তা সিনেটের সদস্যদের কাছে বিলি করে। ঐ প্রস্তাবে আশুতোষ লিখলো, এদেশেও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। আর তা বিশ্ববিদ্যালয়েরই করা কর্তব্য। বিলেতে গেলেই যে বড় পণ্ডিত হবে এমন কোন কথা নেই।

প্রতিবাদের ফল হলো শুভ। সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ এই পুস্তিকা পাঠ করে পরীক্ষা তুলে দেবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

আশুতোষের তখন আনন্দ দেখে কে। তার জয় জয়াকার। ছাত্রমহলে তার খুব প্রশংসা হলো।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলো

আশুতোষ। ঐ পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করলো। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করলো। গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্যে লাভ করলো হরিশ্চন্দ্র পুরস্কার।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৫০'০০ টাকার বৃত্তি দেওয়া হলো। বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার এক মাস পরে আশুতোষ ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তৈরী হয়েছিল! তখন এই প্রকার নিয়ম ছিল। বি, এ পড়তে পড়তে আশুতোষ এম, এ পরীক্ষার নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়ে ফেলে। কিন্তু তার অধ্যক্ষ রো সাহেব তাকে বললেন এক সঙ্গে দু'টি পরীক্ষা দেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে বি-এ-তে ইংরিজীতে প্রথম হতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপালের কথাই রাখলো আশুতোষ। ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষা দিলো না। পরের বছর নভেম্বর মাসে গণিত শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে স্বর্ণপদক পায়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার এম-এ পরীক্ষা দিলো আশুতোষ। এবার তার পরীক্ষার বিষয় ছিল তিনটি। যথা, বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্রগণিত ও পদার্থবিদ্যা। এই তিন বিষয়ের তিনজন পরীক্ষক ছিলেন যথাক্রমে সাহেব-বুথ, ইলিয়ট ও গিলিল্যাণ্ড।

এই বছরেই আশুতোষ গণিতে স্টুডেন্টসিপ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। এখন সে এম-এ, পি, আর, এস। শিক্ষকরা তার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর মতামত প্রকাশ করতেন।

সিণ্ডিকেটে আশুতোষ প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ আলোচনা চলতো। এর অন্য একটা কারণও ছিল। কারণটি এখানে বলছি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক হবার জন্যে প্রার্থী হলো। তখনকার দিনে সংস্কৃত, আরবী ও পার্শী ছাড়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্য উচ্চ পরীক্ষাগুলির পরীক্ষক হতেন ইংরাজগণ। আশুতোষ এই রীতি ভাঙ্‌তে চাইলো। সে গণিতের পরীক্ষক হবার জন্যে আবেদন করলো।

সিণ্ডিকেটে তার আবেদন-পত্র নিয়ে আলোচনা উঠলো। তার পক্ষে ও বিপক্ষে মোট সাতজন দাঁড়ালেন। এই সাতজনের মধ্যে তার পক্ষে ছিলেন চারজন। আশুতোষের আবেদন গ্রাহ্য হলো। সেই-ই হলো এম-এর প্রথম ভারতীয় পরীক্ষক। সে প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই পদ অলঙ্কৃত করে। সেই সঙ্গে চললো বিলেতের নানান্ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা। কেমব্রিজের বিখ্যাত পত্রিকা 'মেসেঞ্জার অফ্ মেথামেটিকস্'-এর সম্পাদক মিঃ ক্লেসায়ারের সঙ্গে এভাবে পত্রমারফৎ আশুতোষের পরিচয় হয়। বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়ে বিলেতে একটি সভা আছে। তার নাম রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি। ক্লেসায়ার সাহেব এই সোসাইটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় আশুতোষ ঐ সমিতির সভ্য হয়। এখন থেকে তার নামের পাশে ডিগ্রীর সঙ্গে আর একটি কথা লেখা হলো এফ্, আর্ এ, এস্। অর্থাৎ ফেলো-অব্-দি রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটি। পরের বছর সে এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটিরও সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়। ঐ বয়সে এই সম্মান লাভ করা বড় কম কথা ছিল না।

তার আগে আর কোন বাঙালী এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয় নি।

আইন শাস্ত্র পাঠ করার জন্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল আশুতোষের! সে যখন বি, এ পড়ছিল তখন থেকে আইনের গ্রন্থ পাঠ করতো। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সে সিটি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আইন অর্থাৎ 'ল' পাশ করে। এর ঠিক পাঁচ বছর পরে আশুতোষ লাভ করলো ডি. এল. বা 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি।

এভাবে আশুতোসের ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবার থেকে সুরু হবে আশুতোষের বিরাট কর্মজীবন।

শিক্ষাজীবন শেষ হয়েছে। এবার আশুতোষ আরম্ভ করবেন কর্মজীবন। প্রথমে তাঁর কাছে এক পত্র এলো শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফট্-এর কাছ থেকে। তিনি বললেন আমার বিভাগে চাকরী খালি আছে। মাইনে মাসিক ২৫০ টাকা।

উত্তরে আশুতোষ বললেন, চাইনা আমার ও-চাকরী। আমি অতো কম মাইনের চাকরী নিয়ে কি করবো। আমার যা যোগ্যতা আছে তার জোরে আমি বেশী মাইনের চাকরী জোগাড় করতে পারবো।

আশুতোষ ঐ চাকরী প্রত্যাখান করলেন। তাছাড়া আর একটা কারণও ছিল তাঁর চাকরী প্রত্যাখ্যানের! তিনি দেখলেন ইংরেজ অধ্যাপক বা বিলেত ফেরৎ হলে তাকে বেশী মাইনে দেওয়া হয়, অথচ দেশীয় লোক গুণীজ্ঞানী হলেও তার যথোচিত সম্মান নেই।

আশুতোষ মনোমত চাকরী না পেয়ে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করবেন বলে স্থির করলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যোগ দিলেন কোলকাতার প্রধান বিচারালয়ে। সেখানে তিনি স্যার রাসবিহারী ঘোষের নিকটে শিক্ষানবিশী করতে লাগলেন। জজেরা তাঁর অদ্ভূত সওয়াল শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

পরের বছর তিনি হলেন সিনেটের সদস্য। আশুতোষ

বলতেন, শৈশব থেকে আমি দুটো স্বপ্ন দেখতুম। প্রথম আমি বড় হয়ে হাইকোর্টের জজ হবো, দ্বিতীয় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করবো।

পরে তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কত ভালবাসতেন তার প্রমাণ আছে অজস্র। তাঁর দাদার আমলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে অনেক কিছু জানতে পারেন। কিন্তু তা ছাড়াও তিনি অন্য সূত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে জানতে পারেন।

আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ব্যারিস্টার মিঃ ডাব্লিউ এ মনট্রাই প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়াতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মনট্রাই সাহেব সিনেটের সভ্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক খবর রাখতেন। তাঁর সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল এক প্রস্থ ক্যালেণ্ডার ও মিনিটস্। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মনট্রাই সাহেব এগুলি সংগ্রহ করেন। সাহেবের মৃত্যুর পর এই লাইব্রেরী নিলামে বিক্রী হয়ে যায়। আশুতোষ ঐসব মিনিটস্ কিনে রাখেন এবং সেগুলি পাঠ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে অনেক কিছু জানতে পারেন।

স্যার কাংটনি ইলবার্ট ছিলেন শাসন বিভাগের একজন হোমড়া-চোমড়া অফিসার। তিনি বিলেতে যাবার আগে আশুতোষকে বললেন, তুমি আমার নিকট কি চাও? বলো, আমি তোমার কি করতে পারি?

তখন আশুতোষ সবেমাত্র এম-এ পাশ করেছেন। কোন

চাকরী না চেয়ে তিনি বললেন, আমাকে সিনেটের ফেলো নির্বাচন করুন।

ইলবার্ট বললেন, আচ্ছা আমি গভর্নমেণ্টকে এ বিষয়ে একটা 'নোট' পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এরপর তিন বছর কেটে গেল। আশুতোষ বিলেতে ইলবার্টের কাছে এক পত্র লিখলেন ; 'প্রিয় মিঃ ইলবার্ট, আমি এখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হতে পারিনি। আপনি ইতিপূর্বে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ কাজ হয় নি।'

ঠিক সময়ে চিঠির জবাব এলো। মিঃ ইলবার্ট লিখলেন, 'লর্ড ল্যান্সডাউন ভাইসৃরয় হয়ে ভারতে যাচ্ছেন, তাঁকে আমি তোমার কথা বলেছিলাম।'

এরপর লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতে ভাইসৃরয় হয়ে আসেন। তখনকার আমলে ভাইসৃরয় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। তিনি আসার অল্পদিন পরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আশুতোষ একজন ফেলো নিযুক্ত হন। এর দু'মাস পরেই তিনি সিণ্ডিকেটের অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। এত অল্প বয়সে কেউ সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন নি।

সিণ্ডিকেটের প্রতিটি সভায় যোগদান করতেন আশুতোষ। সভা আরম্ভ হবার আগে তার বিবরণী প্রসঙ্গে সবকিছু জেনে নিতেন।

এরপর দু'বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আশুতোষ ছাত্র

সমাজের কল্যাণ চিন্তা করে এক পরিকল্পনা তৈরী করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এক পত্র লিখলেন। সেই পত্রে প্রকাশ করলেন তাঁর পরিকল্পনার আংশিক রূপ। তিনি বললেন এনট্রান্স থেকে এম-এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষায় একটা পরীক্ষা নেওয়া হোক আর ভাল বাংলা ভাষায় রচনার পরীক্ষা গৃহীত হোক।

চার মাস পরে সিণ্ডিকেটের এক সভা বসলো। ঐ সভায় আশুতোষের পত্র বিবেচনা করার জন্যে পণ্ডিত অধ্যাপকগণ মিলিত হলেন। সভাপতি হলেন স্যার আলফ্রেড ক্রফট। উমেশ চন্দ্র দত্ত সমর্থন করলেন আশুতোষের প্রস্তাবটি। তারপর সুরু হয়ে গেল তুমুল বাক্-বিতণ্ডা।

বেশীর ভাগ সভ্যই বাংলা ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। সাহেবরা বললেন, বাংলা কি একটা ভাষা? এই ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কই? বাংলায় আবার পরীক্ষা।

সংস্কৃত পণ্ডিতরা বললেন, বাংলা ভাষার পরীক্ষার প্রচলন হলে সংস্কৃতের মর্যাদা নষ্ট হবে।

মুসলমান সভ্যরা বললেন, আমাদের ছেলেরা ভাল বাংলাও জানে না, ভাল উর্দু কিংবা পার্শিও জানে না। কাজেই এই প্রস্তাব গৃহীত হলে তারা কোন পরীক্ষাতেই পাস করতে পারবে না।

এক ঘণ্টা ধরে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝালেন আশুতোষ। কিন্তু কোন সুরাহা হলো না। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিও অনেক করে বোঝালেন।

কিন্তু কোন ফল হলো না। এতটুকু দমলেন না আশুতোষ। আশা রাখলেন, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা অবশ্য পাঠ্য করবেন। তার দশ বছর পরে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা গৃহীত হবার ব্যবস্থা করলেন আশুতোষ। সে কথা পরে বলছি।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কোলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। তখন তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন না, ছিলেন তাঁর মা জগত্তারিনী দেবী। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী এবং বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন।

তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন, জজের চাকরীর তুলনায় ওকালতি অনেক ভাল। এ হচ্ছে স্বাধীন ব্যবসা। এতে আছে মান-সম্মান।

আশুতোষ কিন্তু রাজী হলেন না! বললেন, বাবার বড় ইচ্ছে আমি জজ হই। তাছাড়া জজের চাকরী করলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করার সুযোগ পাবো।

জগত্তারিণী আশুতোষের কথা ও যুক্তি নাকচ করতে পারলেন না। নীরব চিত্তে মেনে নিলেন।

আশুতোষ ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান। খুব কম জায়গায় তিনি মায়ের কথা মত কাজ করেন নি। অবশ্য তা মঙ্গলের জন্যেই। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বিদ্যাসাগর এবং গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের মত আশুতোষের মাতৃভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ।

বিংশ শতকের প্রথমভাগে সম্রাট এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক হয়। তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। কলকাতা ছিল তখন

ভারতের রাজধানী। সেই কারণে ভারত সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এই মহানগরীর প্রতিনিধি রূপে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বড়লাট নিমন্ত্রণ করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের কাছে অনুরোধ করেন, আপনারা বিলেতে যান। সেখানে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করুন।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ। গররাজী হলেন। বললেন, বিলেত যাওয়াতে আমার মার নিষেধ আছে।

তাই শুনে বড়লাট বললেন, আপনার মাকে বলবেন, ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির আদেশে আপনাকে বিলেত যেতে হবে।

আশুতোষ বড় লাটের মুখের ওপর জবাব দিলেন, আমার মা কি উত্তর দেবেন আমি তা বলতে পারি। তিনি বলবেন, আশুতোষের জননী এ কথা স্বীকার করবেন না যে তাঁর পুত্রকে তিনি ছাড়া আর কারও আদেশ দেবার অধিকার আছে।

এমনি স্বাধীনচেতা ও মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন আশুতোষ। দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ তিনি হাইকোর্টে কাজ করেন। এই বিশ বছরে তিনি লেখেন দু'হাজারের ওপর রায়।

মাঝে মাঝে হাইকোর্টের বিশেষ বিশেষ ফুল বেঞ্চ বসতো। তখন তিনি অন্যান্য বিচারপতিদের সঙ্গে বসে রায় লিখতেন। সেসব রায়ের সংখ্যাও কম নয়।

একবার এমন হলো যে সে বছর তিনজন বিচারক একসঙ্গে ৮০৩টি মোকর্দ্দমার বিচার করেন। এর মধ্যে আশুতোষ নিজে ৮০০ মামলার রায় লেখেন। তাঁর কর্মকৌশল এবং বিচার-

বুদ্ধি ছিল অনন্যসাধারণ। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ডসন মিলার বলেন, 'স্যার আশুতোষের রায়গুলি উদ্ধৃত করলেই তা আপনা আপনি সার্বজনীন সম্ভ্রম আকর্ষণ করবে।'

এই প্রসঙ্গে আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বলেন,— 'পিতৃদেবের বিচার-বুদ্ধি ও ব্যবহার শাস্ত্রের সাজ-সরঞ্জাম বিপুল ছিল,— রোমান সময় হইতে নিতান্ত আধুনিক সময় পর্যন্ত আইনের বিকাশ এবং তাহার বিরাট ইতিহাস তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। প্রত্যেক দেশের বিচার-পদ্ধতি এবং আইন কানুন তিনি অবগত ছিলেন। কি সূত্র এবং নজিরে কোন বিচার-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, তাহার ব্যপদেশে আমেরিকার সুপ্রীম-কোর্ট ও তদন্তর্গত ছোট কোর্টের বিচার ও আইনাদি সম্পর্কেও তিনি তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পরিচয় দেখাইতেন। ব্রিটিশ ও অপরাপর ঔপনিবেশিক দ্বীপপুঞ্জগুলির এবং প্রাচীন ভারতের আচার নিয়ম, আইন প্রভৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। সুতরাং তিনি যে সকল বিচার করিতেন, সেই বিচার-সিদ্ধান্তে সমস্ত জগতের ব্যবহার-শাস্ত্রের মূল নীতিগুলির আলোক পড়িত।'

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ হাইকোর্টের জজিয়তির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১০

আশুতোষের নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার জন্যে লোকে তাঁকে বাংলার বাঘ বলে ডাকতো। এ সম্বন্ধে একটা বেশ সুন্দর ঘটনা মনে পড়ছে। এক সময় স্যার আশুতোষ ট্রেনে করে আলিগড় হতে ফিরছেন। তিনি যে কামরায় ছিলেন সেই কামরায় একজন ইংরেজ মিলিটারী অফিসার উঠলো।

আশুতোষ বেঞ্চের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর সদ্য কেনা ন্যাকড়ার জুতো জোড়ার একপাটি তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

এদিকে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। সাহেবের তন্দ্রা এলো। আশুতোষ জেগে উঠেছেন। জুতোর দিকে নজর পড়তেই দেখেন তাঁর এক পাটি জুতো নেই! ব্যাপারটি বুঝতে তাঁর আদৌ দেরী হলো না। তিনি তখুনি হুকেতে ঝোলানো সাহেবের কোটটি টেনে নিয়ে ট্রেনের জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাহেবেরও ঘুম ভাঙলো। সে কোটটি খুঁজতে গিয়ে পেল না। ভীষণ গোলমাল সুরু করে দিলে। আশুতোষকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে নির্ভীকচিত্তে তিনি বললেন, 'তোমার কোটটি আমার এক পাটি জুতো আনতে গেছে।'

আশুতোষের অদ্ভুত তেজস্বিতা ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হলো। ভাবলে একজন নেটিভের মনে এরকম সাহস থাকতে পারে। বিশেষ করে তখনকার দিনে

ইংরেজরা ভাল চোখে দেখতো না এ দেশের মানুষদের। তাদের ধারণা, ভারতীয়রা সকলে ভীরু ও দুর্বল।

আশুতোষ ইংরেজদের এই প্রকার হীন ধারণার অবসান ঘটালেন।

আশুতোষের জীবনে যেমন ছিল তেজস্বিতা তেমনি ছিল স্বজাত্যাভিমান। একবার আশুতোষকে বিশেষ কর্মোপলক্ষে যেতে হয়েছিল মহীশূরের রাজদরবারে। সেই সময় নিয়ম ছিল রাজার সামনে এলে সাধারণ পোষাকে এলে চলবে না। রীতিমত রাজবেশ ধারণ করে আসতে হবে।

তেজস্বী আশুতোষ কিন্তু নিজস্ব পোষাক ত্যাগ করতে চাইলেন না। তিনি বললেন, আমি বরং কোলকাতায় ফিরে যাবো তবু আমি নিজস্ব বেশভূষা ত্যাগ করে অন্যের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে রাজদরবারে হাজির হতে পারবো না।

আশুতোষের এই মনোভাবের কথা পৌঁছলো রাজার কানে। তিনি মন্ত্রী মারফৎ সব কিছু বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে সটান চলে এলেন আশুতোষের কাছে। বললেন, এ নিয়ম আপনার জন্যে নয়। আপনি নিজস্ব বেশভূষা পরিধান করে রাজদরবারে প্রবেশ করতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত আশুতোষ তাই করলেন।

আশুতোষের তেজস্বিতা এবং স্পষ্টবাদিতার আর একটি নিদর্শন এখানে দিচ্ছি।

একসময় লর্ড কার্জন একটি সভায় বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার কথা ফলাও করে প্রচার করলেন। আশুতোষ উপস্থিত ছিলেন

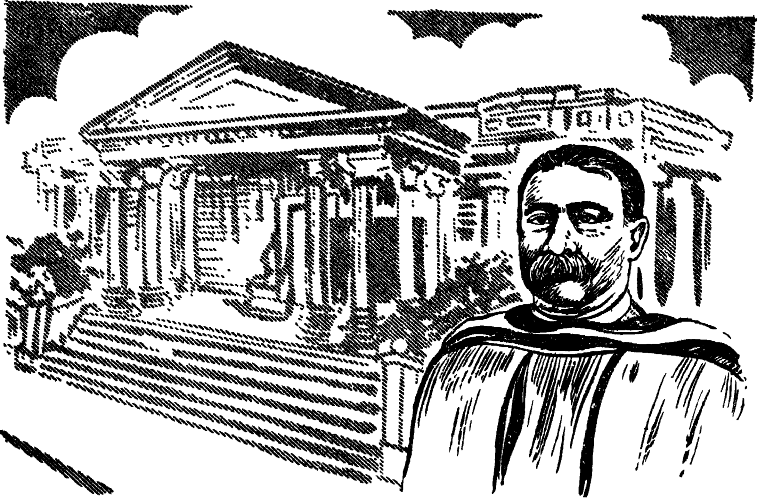
সেই সভায়। তিনি তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করলেন। সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন, বাঙালী চরিত্রে যদি কোন দুর্বলতা এসে থাকে তবে তা এসেছে ইংরেজদের জাতীয় দুর্বলতা থেকেই।

আশুতোষের কাছ থেকে, এরূপ কড়া মন্তব্য শুনে বিদেশী শাসক হতবম্ভ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে একটি কথা পর্যন্ত উচ্চারিত হলো না।

এমনি নির্ভীক এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন স্যার আশুতোষ। তাঁর চরিত্রে এই মহৎ গুণের জন্যে তাঁকে বলা হয় বাংলার বাঘ। তাঁর এই মহৎ গুণ ছিল বলেই তিনি বাঙালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পেরে ছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন আশুতোষ। একাধিক ক্রমে আটবছর তিনি এই পদে আসীন হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি কিছুদিনের জন্যে ঐ পদে নিযুক্ত হন।



সিনেট্‌হলের সামনে ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তখন কেবল সিনেট হাউস তৈরী হয়। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল কেবল পরীক্ষার ফী গ্রহণ করা। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন কয়েকটি কলেজে

ছাত্ররা এম-এ পড়াশুনো করতো। মোট কথা তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কেবল নামেই ছিল, কাজে কিছু নয়।

এইসব দেখে শুনে লর্ড কার্জন একটি কমিশন বসান। স্যার সাড্‌লার ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। এই কমিশনের কাজ ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। 'স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হন। স্যার গুরুদাসই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার। এই কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেন তারই ভিত্তিতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হলো এবং সিণ্ডিকেটের পরিচালনার জন্যে নতুন আইন-কানুন রচিত হলো।

আইন পাশ হবার ঠিক দু'বছর পর লর্ড কার্জন স্যার আশুতোষকে অনুরোধ করলেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করুন।

আশুতোষ রাজী হলেন। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্যে উপায় স্থির করতে লাগলেন। সেই মত আইন-কানুনও রচিত হলো। তাই নিয়ে সিণ্ডিকেটের সভায় তুমুল তর্ক-বিতর্ক লেগে গেল। সেদিনের সভা চলেছিল চার-পাঁচ ঘণ্টা।

এইরকম সভা একবার চলেছিল সাতদিন ধরে। আশুতোষ বেশী কথা বলতেন না। তাঁর বক্তব্য বিষয় তিনি বুঝিয়ে দিতেন অতি অল্প কথায়। তাঁর যুক্তি শুনে বিরোধীরা নীরব হয়ে যেতেন।

একদিন সিণ্ডিকেটের এমনি এক সভা বসলো। সেই সভায় তুমুল হৈ হট্টোগোল দেখা গেল। সকল সদস্যই প্রবল বিরোধিতা শুরু করে দিলে। এমনকি স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত করলেন। সকলে ভাবলেন এবার বোধহয় স্যার আশুতোষ পরাজয় স্বীকার করবেন।

কিন্তু তাঁদের সে আশা দুরাশা মাত্র। আশুতোষ একাই একশো। বিকেল চারটের সময় সিণ্ডিকেটের সভা বসলো। তর্ক-বিতর্ক হতে হতে রাত সাতটা বাজলো এবার আশুতোষ সকলের মতামত শুনে নিয়ে নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর জোরালো যুক্তি দিয়ে নিজের মনের অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন। তখন সকলে অবাক হয়ে গেলেন আশুতোষের কথা শুনে। মেনে নিলেন আশুতোষের নয়া প্রস্তাব। নতুন নিয়ম কানুন। এর ফলে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় নতুন রাজ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। উন্নতি দেখা দিলো। এইসব কারণে স্যার আশুতোষকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,—'শেষে আশুতোষ উঠলেন, তাঁহার হাতে একখানি বিখ্যাত বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার। তিনি তাঁহার এক পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িলেন। বহু বৎসর পূর্বে এই প্রকার নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপদেশে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের মধ্যে আন্দোলন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরাও যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন,সদস্যরাও সেই যুক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে এরূপ

নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা একেবারে নিস্ফল হইবে। আশুতোষ ঐ ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টাইয়া বহু বৎসর পরের একটা বিবরণীর অংশ পাঠ করিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল,—এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার সময় যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না—নিস্ফল হইবে, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। এখন তাঁহাদের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষীত হইয়াছে যে, এই নিয়মগুলি খুব হিতকর এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন।'

আগেই বলা হয়েছে যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝাত কয়েকটি থামওয়ালা সিনেট হাউস। এখানে পরীক্ষা সম্পর্কে আইন-কানুন, পরীক্ষার্থীদের নাম-ধাম-সংখ্যা, কোন্ স্কুল বা কোন্ কলেজ থেকে কোন্ পরীক্ষা দেওয়া হয় তার তালিকা, প্রশ্নপত্র তৈরী করা ও তা ছাপান, পাশের তালিকা ইত্যাদি পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হতো আর সিণ্ডিকেট হাউসে বসে উক্ত সভার সভ্যগণ এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। অন্যদিকে পরীক্ষায় যারা প্রথম হতো তাদের বৃত্তি, পদক দেবার ব্যবস্থা হতো। ভাইসচ্যান্সেলার তার জন্যে একটা নির্দিষ্ট দিন স্থির করতেন। ঐ দিনে বসতো কনভোকেশনের সভা। চ্যান্সেলার আসতেন সভায় শোভা বর্দ্ধন এবং ছাত্রগণকে উপাধি এবং পারিতোষিক প্রদান করতে। এই হচ্ছে তখনকার দিনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিসর।

স্যার আশুতোষ এর কর্ণধার হয়ে আরম্ভ করলেন আমূল

পরিবর্তন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস খুললেন। এম-এ ক্লাসে নানা বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলেন। রিপোর্টেরও ব্যবস্থা হলো। এই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে জায়গার প্রয়োজন। তাই সিনেট হাউসের কাছেই গড়ে উঠলো এক গগনস্পর্শী অট্টালিকা।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের উদ্বোধন করাই হচ্ছে আশুতোষের অন্যতম প্রধান কীর্তি।

এদিকে কলেজ থেকে এম-এ উঠে যাওয়ায় অনেক প্রতিবাদ উঠলো অধ্যক্ষদের কাছ থেকে।

তাঁরা বললেন, কলেজ থেকে যদি এম-এ ক্লাস উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মাথা থেকে মুকুট কেড়ে নিলে যেরকম হয় ঠিক সেই রকম হবে আমাদের অবস্থা।

কেউ কেউ বললেন, এম-এ ক্লাস বর্জিত কলেজ কলেজই নয়।

আবার কেউ কেউ বললেন, এতদিন যে মর্যাদা আমরা ভোগ করে আসছি আজ তা থেকে আমরা কেন বঞ্চিত হবো?

আশুতোষ ধীরভাবে শুনলেন সকলের কথা। তারপর নিজে বললেন, 'এখন কোলকাতার কৃতী অধ্যাপকেরা নানা কলেজে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করছেন। তাঁদের কেউ হাটে-পথে পড়ে নেই। কেউ আছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, কেউ স্কটিশচার্চ বা অন্য কোন কলেজে। তাঁরা তো কোন একটা কলেজের একচেটিয়া সম্পত্তি বলে গণ্য হতে পারেন না?

তিনি আরও বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসগুলি যদি এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যে, এই দেশের যাঁরা সেরা অধ্যাপক

তাঁদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাপনার কাজে এখানে নিয়োগ করা যায়, তবে সব ছাত্রই তাঁদের অধ্যাপনায় উপকৃত হতে পারবে'।

সবশেষে বললেন, 'সার্বজনীন জাতীয় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্যেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্নাতকোত্তর বিভাগ খুললাম।

কিন্তু অধ্যক্ষগণ শুনলেন না আশুতোষের কথা। তারপর সর্বশেষ সিনেটসভায় আশুতোষের পরিকল্পনা গৃহীত হলে সকলে বিস্ময় বোধ করলেন। এমন কি বড়লাট আশুতোষের কীর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হলো এম-এ ক্লাস। একজন দু'জন করে অধ্যাপক আসতে লাগলেন।

অনেক দাতা এগিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির মূলে অর্থদান করতে। তাঁরা হলেন তারকনাথ পালিত, স্যার রাস-বিহারী ঘোষ ও খয়রার রাজা। তারকনাথ পালিত ও রাস-বিহারী ঘোষ নিজেদের বসতবাড়ী দান করে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্যে। আশুতোষ তাঁদের নাম খুব করতেন। তাঁদের দেখাদেখি অনেক ধনী ব্যক্তিও এগিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে সরকারী দানও কম ছিল না।

বেসরকারী দানের জন্যেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যান।

উচ্চ শিক্ষার জন্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন জায়গা হতে অনেক ছাত্র এসে ভর্তি হলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে ইতিহাস, দর্শন, গণিত, সংস্কৃত, ইংরাজী, পালি, প্রাকৃত ও প্রাদেশিক ভাষা পড়ানো আরম্ভ হলো।

আশুতোষ জানতেন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতিভেদের স্থান নেই। তাই তিনি ভাবলেন, হিন্দুর মত ইসলামের জন্যেও তিনি সুউচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন! মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, অলংকার সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে পঠন-পাঠনের জন্যে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। চীন ও জাপানের ভাষা শিক্ষাও বাদ গেল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ ছিল আশুতোষের। তিনি বাংলা ছাড়া হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-পরিচয় সঙ্কলন করালেন। এভাবে উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষ কুড়িটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। সেই সঙ্গে ভারত এবং তার বাইরেকার বিভিন্ন দেশ থেকে নামী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে প্রাণ-মন নিয়োগ করেন। তাঁরা হচ্ছেন মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত ভাণ্ডারকর, সিংহলের পণ্ডিত রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ, ত্রিবাঙ্কুরের অনন্তকৃষ্ণ, কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, মিথিলার মিশ্রজী, মাদ্রাজের সি, ভি, রমণ, অন্ধ্রের ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বোম্বাইয়ের তারাসুরওয়ালা, পারস্যের শিরাজ, জাপানের মানুদা, চীনের কিমুয়া, লণ্ডনের স্টফেন ও ক্যালিস এবং জার্মানীর পণ্ডিত ব্রুল।

এভাবে কর্মযোগী এবং পুরুষসিংহ আশুতোষ অচিরে অসাধ্যসাধন ঘটালেন।

১২

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে দেশবাসীরা একবাক্যে আশুতোষকে অভিনন্দন জানালে। তিনি হচ্ছেন বাংলার বরেণ্য পুরুষ।

কিন্তু ছাত্ররা সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তাদের মনে কেমন যেন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। বিশেষ করে পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্রের ব্যাপার নিয়ে। তাদের ধারণা নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও নিশ্চয়ই কঠিন হবে।

এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন আশুতোষ। এতদিন নিয়ম ছিল যে প্রশ্নকর্তারা পরীক্ষার জন্যে যে সব প্রশ্নপত্র রচনা করতেন তার পুনর্বিবেচনার কোন আবশ্যক ছিল না। এখন থেকে ঐ নিয়ম বদলে গেল। নতুন নিয়মের দরুণ এই স্থির হলো যে প্রশ্নকর্তা প্রশ্নপত্র তৈরী করার পর পুনর্বিবেচনার জন্যে সেগুলি ভাইস চ্যান্সেলারকে যেন দেখায়।

স্নাতকোত্তর বিভাগে যতগুলি বিভাগ বা ফ্যাকলটি ছিল তার অনেকগুলিরই সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ।

সিণ্ডিকেট থেকে প্রশ্নকর্তাদের কাছে নির্দেশ গেল, ফ্যাকলটির প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তবে যেন প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়।

একদিন আশুতোষ একজন প্রশ্নকর্তাকে ডেকে বললেন, মশাই, এটা মনে রাখবেন যে প্রশ্ন দ্বারা আপনার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় আমরা বিচার করবো না। আপনি কত বড় বিদ্বান তা

ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে আশ্চার্যান্বিত করতে যাবেন না। এটা সর্বদা মনে রাখবেন, যে-যে শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হবে সেই-সেই শ্রেণীর বালকদের কাছে আপনার যা ন্যায়ত প্রত্যাশা করতে পারেন সেই পরিমাণ বিদ্যা তাদের হয়েছে কিনা তাই দ্রষ্টব্য। তার অতিরিক্ত কোন জটিল সমস্যা দ্বারা পরীক্ষাগৃহে তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবেন না।

আশুতোষের আদেশ এবং উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রশ্নকর্তা।

এই প্রসঙ্গে একটা বেশ মজার ঘটনা এখানে বলছি। প্রসিদ্ধ গাণিতিক গৌরীশঙ্কর দে একবার প্রবেশিকা পরীক্ষার গণিতের প্রশ্নপত্র রচনা করে নিয়ে আসেন আশুতোষের কাছে। সেদিন ছিল রবিবার। বেলা প্রায় এগারোটা। আশুতোষ তখন স্নান করতে যাবেন। চাকর তেল মাখাচ্ছিল।

অধ্যাপক তাই দেখে ইতস্তত করতে লাগলেন।

আশুতোষ বুঝতে পারলেন অধ্যাপকের মনোভাব। তিনি তাঁর হাত থেকে প্রশ্নপত্রের খসড়াটা নিয়ে তার ওপর দু'চারবার চোখ বুলালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এসেছেন?

অধ্যাপক বললেন, হ্যাঁ।

—তবে দু'এক ঘণ্টা এখানে থাকতে পারবেন?

—অনায়াসে।

—বেশ, আমি স্নানাহার সেরে আসি, ততক্ষণ এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভৃত্যকে আদেশ করলেন, এই এঁর জন্যে কালি কলম নিয়ে আয়।

ভৃত্য চলে গেল কালি কলম আনতে।

অধ্যাপক তো বিস্মিত হলেন আশুতোষের কথাবার্তা শুনে এবং তাঁর ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করে।

আশুতোষ আর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন স্নান করতে। ওদিকে ভৃত্য নিয়ে এল কালি-কলম। অধ্যাপকের সামনে রেখে চলে গেল।

অধ্যাপক ঘড়ি ধরে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখতে বসলেন। ঠিক আড়াই ঘণ্টা পরে আশুতোষ এলেন অধ্যাপকের কাছে। এসে দেখলেন, তখনো সবকটি প্রশ্নের উত্তর লেখা হয় নি অধ্যাপকের। দু'একটা প্রশ্ন বাকি আছে।

সব দেখেশুনে আশুতোষ বললেন অধ্যাপককে, তবেই দেখুন, আপনার তৈরি প্রশ্নের উত্তর লিখতে আপনার পক্ষেই এতক্ষণ সময় লাগছে তাহলে ছাত্ররা কত সময় নেবে? ছেলেরাও তো আড়াই ঘণ্টার বেশী সময় পায় না। কাজেই যারা খুব মেধাবী ছেলে তাদের মত করে প্রশ্ন তৈরী করবেন না। যারা মাঝামাঝি দলের ছেলে, তাদেরই মত করে প্রশ্ন তৈরী করবেন। এখন এই প্রশ্ন আবার নতুন করে লিখে আনুন।

আশুতোষের কথামত অধ্যাপক কাজ করতে লাগলেন। প্রশ্নপত্র রচনার ব্যাপারে আশুতোষের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল। এবার তিনি নজর দিলেন বিকল্প প্রশ্নের দিকে। আগে পরীক্ষায় কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকতো। সেগুলির

সব উত্তর না লিখতে পারলে ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষায় পাশ করা কঠিন হতো। সাধারণ বুদ্ধির ছাত্রদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধা হতো। স্যার আশুতোষ এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি বললেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্নের ব্যবস্থা করা হোক।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। এর ফলে পরীক্ষায় পাশের হার বাড়তে লাগলো।

কেবল প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে নয় বিষয়-সম্বন্ধেও নতুন রীতি প্রবর্ত্তিত হলো। কে কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা দেবে তা নির্বাচন করে নেবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হল ছাত্রদের। অঙ্ক অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। অনেক মেধাবী ছাত্র অঙ্কে এসে ঠেকে যায়। আশুতোষ এই ব্যাপারটি বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি কোন কোন পরীক্ষায় গণিতের কড়াকড়ি হ্রাস করে দেন। বাধ্যতামূলক গণিত পরীক্ষা রদ করেন। সংস্কৃত ও ভূগোল অনেক ছাত্রের কাছে পছন্দ নাও হতে পারে। তাই তারা যাতে এই দুই বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হলো।

পাঠ্য তালিকার মধ্যে নির্বাচনের এই প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ফলে ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষায় পাস করা সুবিধের হলো। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগলো পাশের হার।

ছাত্রদের সুখ—সুবিধার দিকে নজর ছিল বলেই আশুতোষ ছাত্র মহলে পরমবন্ধু বলে পরিগণিত হতেন। এই ছাত্রবন্ধু আশুতোষ ছাত্রদের কল্যাণ চিন্তা করতেন। তাঁর দরদী মনের আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। আগেকার দিনে পরীক্ষকগণ

ছাত্রদের নম্বর খুব কম দিতেন। এই কারণে পরীক্ষকদের প্রতি আশুতোষের নজর বিশেষ ভাল ছিল না। আশুতোষের আগেকার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ নম্বর বা ফুল মার্কশ দেবার প্রচলন ছিল না। একবার একজন পরীক্ষককে তিনি বলেন, যদি উত্তর ঠিক হয়ে থাকে তবে তার নম্বর কাটবেন কেন? পূরো নম্বর তার পাওয়ার জন্যেই রাখা হয়েছে। তা কমাবার অধিকার কারও নেই।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সোজা হলো। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগলো নম্বর। ফলে পাশের হারও বেড়ে চললো। তাই দেখে একশ্রেণীর লোকেদের মনে গাত্রদাহ দেখা দিল। তারা বললে, বিশ্ববিদ্যালয় হতে এত ব্যাপক হারে পাশ করলে দেশের দুর্নাম রটবে।

আশুতোষ তখন চ্যান্সেলারকে লিখলেন, উচ্চ শিক্ষার প্রসার কতটা বেড়েছে দেখুন। যদি কঠিন প্রশ্ন করে ছেলেদের থার্ড ক্লাস থেকে ফটক বন্ধ করে বিদায় দেওয়া হয় তবে তারা কি করবে? মূর্খ হয়ে ঘরে বসে থাকবে।

চ্যান্সেলার তাঁর মত সমর্থন করলেন। এক নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে আশুতোষ যে রকম উদারতা দেখিয়ে ছিলেন তার তুলনা নেই। এই কারণে তিনি ছাত্রদের কাছে দেবতার মত পরিগণিত হতে লাগলেন।

এই প্রসঙ্গে আশুতোষের অন্যতম ঘনিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্য দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেনঃ 'মোট ছয়শত কি আটশত নম্বরের মধ্যে দুই, চার, পাঁচ, এমন কি দশ নম্বরের জন্য ছাত্রের

জীবন মাটি হইয়া যায়, ইহা তাঁহার নিকট ন্যায়সঙ্গত বিচার বলিয়া মনে হইত না। কত কষ্টে বাঙালী পিতামাতা ও অভিভাবকেরা ছেলেদের অধ্যয়নের গুরু ব্যয়ভার বহন করেন। ৫টি নম্বর কি ১০টি নম্বরের জন্যে তাহার সংবৎসরের সমস্ত অধ্যয়ন ও বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে, ইহা তাঁহার প্রাণে লাগিত এবং ইহা তিনি কখনই সংযত বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।··· যখন তিনি দেখিতেন, দুই একটি নম্বরের ত্রুটিতে পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ একেবারে মাটি হইয়া যায়, তখন তাহাদের সেই অবস্থা তিনি দয়ার্দ্র চক্ষে দেখিতেন।'

আশুতোষের আর একটি ছাত্রদরদের নমুনা এখানে উদ্ধৃত করছি। গ্রামের এক দরিদ্র ছাত্র বিনা বেতনে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছে হাই স্কুলে। গ্রামের জমিদার বললেন, তুমি যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারো তাহলে তোমার চাকরি হবে।

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হলো। বাংলা পরীক্ষার দিন জ্বর এলো ছেলেটির। পরে পরীক্ষার নম্বর বেরুতে দেখা গেল বাংলা বাদে অন্য সব বিষয়ে সে পাশ করেছে।

এই সংবাদ পেয়ে দুঃখে বিগলিত হলো ছেলেটির অন্তঃকরণ। সেই সময় একজন অধ্যাপক তার বক্তব্য শুনে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার কোন ভাবনা নেই। তুমি চলো আশুতোষের কাছে। তিনি প্রকৃত ছাত্রবন্ধু। কিসে তোমার কল্যাণ হবে সে উপায় বলে দেবেন।

ছাত্রটির মুখ তখন আশার আলোকে ঝলকে উঠলো। সে ভাবলে, এবার বুঝি সে লাভ করেছে স্বর্গের চাঁদ।

একদিন সে অধ্যাপকের সঙ্গে এলো আশুতোষের কাছে। সব শুনে আশুতোষ বললেন ছেলেটিকে, আচ্ছা তোমার উপায় ঠিক হবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে গেছে। তুমি আই-এ পরীক্ষায় বাংলা দাও। তুমি আজই আমার কাছে দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও।

তাই করলো ছেলেটি। যথাসময়ে সে আই-এ তে বাংলা পরীক্ষা দিলো এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলো দ্বিতীয় বিভাগে।

বাংলা ভাষার প্রতি আশুতোষের দরদ ছিল অপরিসীম। সিণ্ডিকেটের সদস্য হওয়ার পর থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সিংহাসন পাতবার চেষ্টা করেন। আগেই বলেছি যে তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা, ইণ্টারমিডিয়েট ও বি,এ তে তিনি বাংলা অবশ্য পাঠ্য করলেন।

তারপর এলো ১৯২০ খৃষ্টাব্দ। এই সালে আশুতোষ বাংলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। অনেকে এই বিষয় নিয়ে অনেক কথা বললেন। বললেন, বাংলায় কি সেক্সপীয়র বা মিলটনের মত কবি আছেন ?

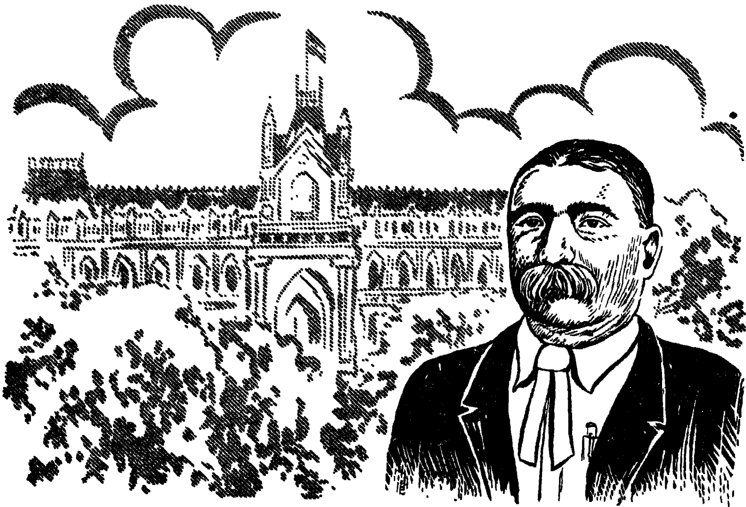
আশুতোষ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আছেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দেই আশুতোষ বংলায় এম-এর প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করেন। দীনেশচন্দ্রকে ডেকে বললেন, দীনেশবাবু, এবার বাংলায় এম-এ বিভাগ খুলবো স্থির করেছি। আপনি ইংরিজীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একখানি ইতিহাস গ্রন্থ লিখুন।

১৩

আশুতোষের কাছে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জীবনের তুলনায় মূল্যবান। হাতে শত কাজ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মন-প্রাণ লেগে থাকতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে।

হাইকোর্ট থেকে অবসর নিয়েছেন আশুতোষ। এবার তিনি পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। সেই সময় একদিন দীনেশচন্দ্র তাঁকে বললেন, আপনাকে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিনও চলবে না। আপনি ছাড়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কায়াহীন ছায়া।



হাইকোর্টের সামনে স্যার আশুতোষ

উত্তরে আশুতোষ বললেন, আশু মুখুয্যে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল হবে, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয় আশু মুখুয্যে

থেকে ঢের বড়। আশু মুখুয্যে একদিন না একদিন মরে যাবে কিন্তু বাঙালী জাতি যতদিন টিকে থাকবে ততদিন এই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টিকে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতেন না আশুতোষ। একবার কনভোকেশন বক্তৃতায় বললেন: 'দেশহিতের জন্যে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করি। পাঠ্য-নির্ধারণ, অধ্যাপক নিয়োগ করা, শিক্ষার বিষয় সাব্যস্ত করা—এইসব ব্যাপারে রাজপুরুষেরা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন?'

সরকার অশুতোষের ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রশংসা করতেন বটে কিন্তু তাঁর কাজে স্বাধীনতা বরদাস্ত করতেন না। আশুতোষ চাইতেন যে তিনি তাঁর কাজে ষোল আনা স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। কিন্তু সরকারী পক্ষ থেকে তাঁকে তা দেওয়া হলো না। এই মনোভাব থেকেই লেগে গেল সংঘর্ষ।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড লিটন। তিনি আবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। ঐ বছরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের সভায় চ্যান্সেলার হিসাবে লর্ড লিটন যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ষোল আনা স্বাধীনতার দাবী করতে পারে না। কেননা গোড়া থেকেই সরকারী কর্তৃত্বাধীনে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করবার জন্যে লর্ড লিটন স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট থেকে কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি করেন। এই

রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছিল, 'সিনেটের সদস্যদের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত লোক এবং তাঁরা সরকারী আইন--কানুনের অধীন হয়ে প্রদত্ত ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে নিয়োজিত হয়েছেন এবং তাঁদের কার্য-রীতির ওপর সর্বদা সরকারের তত্ত্বাবধান থাকবে।'

আশুতোষ নিজে স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি এই কথা মানতে রাজী হলেন না।

চ্যান্সেলারের বক্তৃতা শেষ হলো। এবার আশুতোষ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গড়ে তোলার জন্যে আমি বরাবর শিক্ষাসম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে এসেছি। বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি সম্পূর্ণরূপে এ হতে মুক্ত বলে ঐ দু'টি বিদ্যায়তন পৃথিবীর মধ্যে অমন গৌরবের আসন লাভ করেছে।

উপসংহারে আশুতোষ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রোজব্যারির একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বললেন, 'স্বাধীনতার কেন্দ্রস্থানে এই কথা উচ্চারিত হয়েছিল এবং যিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁর দেশে যদি এই কথাগুলি থেকে থাকে তবে আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপটা যে গুরুতর আশঙ্কার উদ্রেক করবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

আশুতোষের এই প্রকার অপ্রিয় সত্য ভাষণ শোনার পর

সরকারের ঊর্ধতন মহল তাঁর প্রতি সুনজর রাখলেন না। অন্তরে অন্তরে তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন। তাঁরা আশুতোষকে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তবু ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ২৪শে মার্চ লর্ড লিটন আশুতোষকে একখানি চিঠি লিখলেন, 'আপনি এ যাবৎ আমাদের কোন সাহায্য করেন নি, বরঞ্চ আমাদের প্রতি কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন। আপনি আমাদের যে-সমস্ত সমালোচনা করেছেন তা আদৌ গঠনমূলক নয়, বরং আরব্ধ কাজের বিঘ্নকর। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আপনি সরকারের কথা শুনে কাজ করেন। যদি এতে আপনি সম্মত থাকেন তাহলে আপনাকে পুনরায় ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিয়োগ করা সম্পর্কে আমার মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে পারি।

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ লাটসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ২৬শে মার্চ তারিখের এক পত্রে জানালেন, লর্ড কার্জন, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড আমাকে সাদরে ডেকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার দিয়েছেন। আমি অনেক সময়েই সরকারের কাজের প্রতিবাদ করেছি। এ আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কল্যাণের জন্যেই করেছি। তাঁরা একবাক্যে আমার এই স্বাধীন মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। আমার পূর্ববর্তী ভাইস চ্যান্সেলারগণের মধ্যে কেউই গভর্নমেণ্টের ইচ্ছাধীন হয়ে কাজ করেন নি। আমি তাঁদেরই পথে চলেছি। তবে আমি কখনো লাটসাহেবের বা তাঁর মন্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে তিলমাত্রও চেষ্টা করি নি।'

উপসংহারে তিনি লিখলেন, 'আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সহ্য করতে পারছেন না তাতে আমি বিস্মিত হই নি। এদেশে এরূপ একজন ভাইস-চ্যান্সেলার পাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না, যিনি আপনাদের আজ্ঞাধীন হয়েই আদেশ প্রতিপালন করবেন আর সিনেটে গুপ্তচরের কাজ করবেন, তিনি সহজেই আপনাদের অন্তরঙ্গ হবেন।······আমি আপনার পত্রের উত্তরে যা বলবো, তা যাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তাঁর একমাত্র উত্তর এবং আমার বিশ্বাস তাই আপনি ও আপনার মন্ত্রীগণ আমার কাছে প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করেন,—আপনি যে অপমানসূচক প্রস্তাব করে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ আমাকে দিতে চাচ্ছেন তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি।'

ভাইস চ্যান্সেলারের পদ ত্যাগ করলেন আশুতোষ। বাইরে থেকেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। কেবল তাই নয়, এর উন্নতির জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেন।

তখন দেশে নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়েছে। একজন মন্ত্রীর হাতে চলে গেছে সমগ্র শিক্ষাবিভাগটি। স্যার প্রভাসচন্দ্র হলেন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে এক পয়সাও পাবার আশা নেই। অধ্যাপকগণ বড় অসুবিধায় পড়লেন। তাঁরা ঠিক সময়ে বেতন পেতেন না। অতি কষ্টে কাল যাপন করতেন।

এই প্রসঙ্গে জনৈক ভুক্তভোগী অধ্যাপক বলেছেন, 'অধ্যাপকদের বেতন রীতিমত দেওয়া অসম্ভব হলো। কর্তৃপক্ষের অনুগত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আশুতোষের বিরোধী হলেন! তাঁরা

কেবল সিনেট-সভায় তাঁকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হন নি, সাধারণের মধ্যে আশুবাবুর বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন। সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর কার্যকলাপের ওপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগলো। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তা বলবার নয়।'

অনেক নামজাদা অধ্যাপক বেতনের অভাবে কষ্ট পেতে লাগলেন। তাঁরা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ ক'রে কাশী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। যাঁরা অর্থের অভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে গেলেন তাঁরা হচ্ছেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং মেঘনাদ সাহা।

আশুতোষের প্রাণ চাইছিল না যে এই সমস্ত জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপকবৃন্দ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়। তিনি আর কি করবেন। তিনি তো একা। তাঁর নিজস্ব চেষ্টায় অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এখন তিনি নিরুপায়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি এই সমস্ত অধ্যাপকদের বিদায় জানালেন। তাঁর মনে হলো এতদিন ধরে তিল তিল করে শ্রম দিয়ে যে ইমারত গড়েছেন তা এক এক করে খসে যাচ্ছে।

সরকারী দান বন্ধ হয়ে গেল। দেশের লোকের কাছ থেকেও দান এলো না।

তবু আশুতোষ ধৈর্যহারা হন নি। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন ঃ 'যখন টাকার পথ চারদিকে রুদ্ধ হলো তখনো আশুতোষ হটে

গেলেন না, জানু পেতে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন না। এই কর্মীপুরুষ হাল ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন না। বিপদে ধৈর্য এবং উদ্ভাবনী শক্তির অভাব তাঁর কোনদিনই হয় নি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় যাতে বাড়ে তার জন্যে আশুতোষ চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সিণ্ডিকেটকে পরামর্শ দিলেন এই বলে যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়াতে হয় তাহলে প্রবেশিকা এবং অন্যান্য পরীক্ষার ফি বাড়ানো হোক।

সিণ্ডিকেট তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলে। কিন্তু মানলেন না সরকার!

আশুতোষ তার জন্যে দুঃখিত হলেন। সেই সময় জনৈক অধ্যাপক বললেন তাঁকে, আপনি যদি একটু নতি স্বীকার করেন তাহলে আপনার এই ঘোর দুশ্চিন্তা আর আমাদের বিপদ সব তো সহজেই দূর হতে পারে।

তেজস্বী আশুতোষ গর্জে উঠলেন, কার জন্যে নতি স্বীকার করবো? আশু মুখুয্যে সে শর্মাই নয়।

১৪

জন্মালেই মরতে হবে এ একেবারে নিশ্চিত সত্য। তবু মৃত্যু যদি অসময়ে হয় তাহলে তা বড়ই বেদনাদায়ক। আমাদের বাংলার বাঘের অসময়ে মৃত্যু বাংলাদেশের আকাশে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এলো।

আশুতোষ তখন পাটনায়। ডুমরাওন রাজার মোকদ্দমা করবার জন্যে তিনি ১৯শে মে পাটনা রওনা হন। কিন্তু বেশীদিন তিনি সেখানে সুস্থ হয়ে থাকতে পারলেন না। অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২৫শে রবিবার ১৮২৪ খৃস্টাব্দে তিনি শেষে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে দেশবাসী মুষড়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন ঃ 'তাঁর সময়কার তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়।'
